আলো হাতে চলা আঁধারের যাত্রীদের কথা

অনেকেই ভেবে থাকেন বিজ্ঞানের অবদান কেবল বড় বড় যন্ত্রপাতি বানিয়ে মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বয়ে আনা। আমাদের স্কুল কলেজে যেভাবে বিজ্ঞান পড়ানো হয় আর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যে ভাবে বই থেকে 'মানব জীবনে বিজ্ঞানের অবদান' ধরনের রচনা সারা রাত জেগে মুখস্ত করে পরদিন পরীক্ষার খাতায় নৈবদ্য উগরে দিয়ে আসে, তাতে এমনটিই মনে হওয়া স্বাভাবিক। ব্যাপারটা কিন্তু আসলে ঠিক তেমনটি নয়। বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে মানুষ বড় বড় যন্ত্রপাতি বানায় বটে; তবে সেগুলো স্রেফ প্রযুক্তিবিদ্যা আর প্রকৌশলবিদ্যার আওতাধীন, বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের অভিযোজনমাত্র। আসলে বিজ্ঞানের একটা বড় কাজ হচ্ছে প্রকৃতিকে বোঝা, তাকে ব্যাখ্যা করা। বিজ্ঞানের সৌন্দর্যটা আসলে এখানেই। হ্যা, জ্যোৎস্না রাত কিংবা পাখির কুজনের মত বিজ্ঞানেরও একটা নান্দনিক সৌন্দর্য আছে, সৌকর্য আছে, যার রসাস্বাদন কেবল বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। বিজ্ঞানমনস্ক হতে হলে বিজ্ঞানীই হতে হবে এমন কোন কথা নেই, তবে বিজ্ঞানপ্রেমিক হতে হবে বলাই বাহুল্য। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কার্ল স্যাগান তার বিখ্যাত 'The Demon-Haunted World' বই এর ভুমিকায় এ জন্যই হয়ত বলেছিলেন, 'সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা না করাকে এক ধরনের বিকৃত মনোভাব বলেই আমার মনে হয়। যখন মানুষ প্রেমে পড়ে, তখন সারা পৃথিবীর কাছে সে তার প্রেমের কথা প্রচার করতে চায়। এই বইটি আমার প্রেমের একটি ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি, বিজ্ঞানের সাথে আমার সারা জীবনের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ইতিকথা।' আমার বইয়ের ভুমিকা লিখতে গিয়ে কার্ল স্যাগানের উপরের লাইনগুলোর চেয়ে আর মানানসই কোন কথা আমি খুঁজে পেলাম না। এবইয়ের প্রতিটি লাইন লিখতে গিয়ে আমি নতুন করে খুঁজে পেয়েছি আমার 'আমি' কে; প্রকাশ করেছি বিজ্ঞানের সাথে গড়ে ওঠা আমার নিবিড় সম্পর্ককে।

আমার এ বইটি আসলে হাটি হাটি পা পা করে বিশ্বব্রহ্মান্ডের রহস্য সমাধানে নিমগ্ন যাত্রীদের পথ চলার একটি সংক্ষিপ্ত দলিল; শতাব্দী প্রাচীন বিশ্বাসের অচলায়তন ভেঙ্গে যাঁরা বিজ্ঞানমনস্ক সভ্যতার বিনির্মানে আলোর মশাল জ্বালিয়েছেন নিকষ কালো আঁধারে পথ দেখাতে, এ বই সেই সব যাত্রীদের বর্ণিল জীবনালেখ্য। তবে এই বইটি শুধু কয়েকজন আঁধারের যাত্রীদের নিরস জীবনকথা ভেবে নিলে ভুল হবে, বইটি মুলতঃ আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বলোকের সামগ্রিক রূপটি তুলে ধরবার একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রয়াস। মহাবিশ্বের বিচিত্র গঠন ছাড়াও এর উৎপত্তির অনুমিত ধারণা, মহাবিশ্বের বিবর্তন ও সম্ভাব্য পরিনতি সম্পর্কে দুরূহ তত্ত্বগুলোর সহজবোধ্য পরিবেশনার কাজটি করতে হয়েছে সাধারণ পাঠকদের কথা মাথায় রেখেই। নিউটন গ্যালিলিওর সময় থেকে শুরু করে আজকের স্টিফেন হকিং পর্যন্ত কালের পরিক্রমাকে একটি পর্যায়ক্রমিক ধারায় সুসংবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের এবং স্ট্রিংতত্ত্বের অত্যন্ত সাম্প্রতিক ধারণাগুলো পাঠকদের সামনে তুলে ধরার

প্রয়াস নেয়া হয়েছে। আমার ধারণামতে বাংলাভাষায় এমন উদ্যোগ সম্ভবতঃ এই প্রথম। শেষ অধ্যায়টিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব নিয়ে একটি নিরপেক্ষ আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রবন্ধের এই জায়গাটিতে এসে পাঠকেরা তাঁদের দর্শন গত অনুসন্ধিৎসাটুকুও মিটাতে পারবেন; হয়ত কেউ সেই চিরন্তন জীবন-জিজ্ঞাসার সন্ধান পেতে চাইবেন ওমর খৈয়ামের মত :

'কেনই বা মোর জন্ম নেওয়া
এই যে বিপুল বিশ্ব মাঝ
আসছি ভেসে কিসের স্রোতে-
হেথায় বা মোর কিসের কাজ?
কোথায় পুনঃ কেই বা জানে
ফিরতে হবে একটি দিন
উধাও সে কোন মরুর পরে
হাওয়ার মতই লক্ষ্যহীন।'

সৃষ্টি রহস্যকে যৌক্তিকভাবে অনুধাবন করতে মানুষকে তিনটি বিরাট বাধা পেরুতে হয়েছে। প্রথম বাধাটি হচ্ছে মহাবিশ্বের বিশালতা। মহাবিশ্ব যে ঠিক কতটা বড় তা আমাদের কল্পণাতেও হয়ত আসবে না। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, একমুঠো বালুতে নাকি থাকে দশ হাজার বালুকণা; আর পৃথিবীর সব সাগর-মহাসাগরের বেলাভূমিতে যে সংখ্যক বালুকণা রয়েছে, তার থেকেও বেশী নক্ষত্র আছে এ মহাবিশ্বে। আমাদের এই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতেই নক্ষত্র রয়েছে প্রায় চল্লিশ হাজার কোটি। যদি আলোর গতিতেও যাওয়া যায়, মিল্কিওয়ের এ মাথা থেকে ওমাথা করতেই এক লক্ষ বছর লেগে যাবে। এ ধরনের গ্যালাক্সি তো আর মহাবিশ্বে একটি দুটি নয়, রয়েছে অন্ততঃ একশ কোটি। এমনি দৃশ্যমান হাজারো-কোটি গ্রহ তারকা আর অদৃশ্য রহস্যময় 'গুপ্ত পদার্থের' ভীরে হারিয়ে যাওয়া 'পৃথিবী' নামক অত্যন্ত সাধারণ একটি গ্রহ থেকে এই মহাবিশ্বের যাবতীয় রহস্য সমাধানে ব্রতী হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এ শুধু সাহসের ব্যাপার নয়, যেন পঙ্গুর গিরি লংঘনের মতই অসম্ভবকে সম্ভব করার এক উচ্চাভিলাসী স্বপ্ন! দ্বিতীয় বাধাটি কালের অগ্রগামীতার। মহাবিস্ফোরনের সময় থেকে শুরু করে বহু ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে আজকের অবস্থানে পৌছুতে প্রায় ১৫০০ কোটি বছর পার হয়ে গেছে। আমরা সময়ের স্রোতে কেবল সামনের দিকেই এগুচ্ছি। পেছনের অনেক ঘটনা, সূত্র আর প্রমাণ কালের পরিক্রমায় আজ হারিয়ে গেছে। সে সমস্ত হারানো ঘটনা, সুত্র প্রমাণ খোঁজার প্রচেষ্টা অনেকটা খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার মতই কষ্টকর! আর তৃতীয় বাধাটি সংস্কারের। এই সংস্কারের বাধাটি ডিঙ্গানোই বোধ হয় সবচাইতে কঠিন। বদ্ধ সংস্কারের কারণেই টলেমীর ভুল ভূ-কেন্দ্রিক তত্ত্ব জনমানসে রাজত্ব করতে পেরেছে প্রায় দু হাজার বছর ধরে। শতাব্দী প্রাচীন সংস্কার আর মিথ্যা অহমিকায় মানুষ ভেবেছে পৃথিবী নামের গ্রহটি ঈশ্বরেরে অনুগ্রহপ্রাপ্ত বিশেষ একটি গ্রহ, মহাকাশের বাকি সবকিছুই এই গ্রহটিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। ঠিক একই অহমিকায় মানুষ

আজও ভেবে বসে আছে সে ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত এক 'বিশেষ' সৃষ্টি - আর তাই উনবিংশ শতাব্দীতে চার্লস ডারউইন এবং এ্যলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস এর প্রস্তাবিত বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করার জোড়ালো প্রবণতা আজও ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই জগদ্দল পাথরের বাধা এক-দু'দিনে দূর হবার নয়। ক্যারেন আর্মস্ট্রং তাঁর 'The Battle of God' বইয়ে বলেছেন, মানুষের চিন্তাধারা অনাদি কাল থেকেই বিকশিত হয়েছে পরিস্কার দুটি ধারায়। এর একটি হচ্ছে 'মিথোস' এবং অপরটি 'লোগোস'। মিথোস এসেছে ইংরেজী 'মিথ' থেকে, আরো গভীরে গেলে পাওয়া যাবে গ্রীক শব্দ musteion। মিথের মূল প্রতিশব্দ গুলো - mystery এবং mysticism যা প্রকাশ করে রহস্যময়তা, দুর্জ্ঞেয়তা, এবং অতীন্দ্রিয়তাকে। ক্যারেন আর্মস্ট্রং এর চোখে 'মিথ' হচ্ছে কতকগুলো রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, (অপ)বিশ্বাস আর সংস্কার - যেগুলোর কোন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ কখনই পাওয়া যায় না। এগুলো মানব মনে জায়গা করে নিয়েছে স্রেফ কতগুলো বিশ্বাসের কাঁধে ভর করে। আর আর্মস্ট্রং গ্রীক শব্দ 'লোগোস'কে বর্ণনা করেছেন 'যুক্তিগ্রাহ্য', 'প্রমাণসাপেক্ষ', 'বিজ্ঞানভিত্তিক' শব্দ ক'টির সাহায্যে। তিনি বলেন, আধুনিক বিশ্বে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, প্রগতি আর উন্নয়নের মূলে রয়েছে এই লোগোস - যা জ্ঞান ও যুক্তির মাপকাঠিতে প্রকৃত বাস্তবতার পরিচয়জ্ঞাপক। সভ্যতার অনিবার্য গতি আসলে মিথোস থেকে লোগোসের দিকে, প্রবীর ঘোষ তাঁর অলৌকিক নয়, লৌকিক গ্রন্থে যেমনি ভাবে সহজ করে বলেছেন - 'বিশ্বাসের বিপরীতে, যুক্তির অভিমুখে'। বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদীরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছেন অবিরত - মানুষের মিথ্যা সংস্কার ভেঙ্গে আমাদের সভ্যতাকে যুক্তির আলোয় আনতে! আমার বইটি সেই চলমান ধারারই একটি ক্ষুদ্র সংযোজন। এ বই তাই শুধু বিজ্ঞানের তত্ত্ব নিয়ে নিরস আলোচনা নয়, এ বই রচিত হয়েছে তাঁদের জন্য যারা যুক্তি ভালবাসেন, যারা অন্ধ-বিশ্বাস সরিয়ে বিজ্ঞান মনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে বিশ্বপ্রকৃতিকে ব্যখা করতে চান, সৃষ্টিরহস্যকে বুঝতে চান।

আমি পেশায় প্রকৌশলী, পদার্থবিজ্ঞানী নই; তবুও বইটি লিখলাম বিজ্ঞানের প্রতি আজন্ম লালিত ভালবাসা থেকেই - যে ভালবাসা আমাকে বিজ্ঞানমনস্ক করেছে, যুক্তিবাদী হতে সাহায্য করেছে, করেছে মুক্ত-মনা। আমার এ বই শুধু বিজ্ঞানের নয়, সেই সাথে যুক্তির এবং মুক্ত-বুদ্ধিরও। আমার এ বইটি লেখার পেছনে একটি ছোটট ইতিহাস আছে। এটি বলতে হলে আমাকে চলে এতে হবে একেবারে আশির দশকের শেষ দিকে। ধর্মের বিভিন্ন নেতিবাচক, কুপমুন্ডুক আর অবৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণার সাথে পরিচিত হয়ে ঈশ্বর আর ধর্ম এ দু' এর উপরেই আমার কিশোর মন ইতোমধ্যেই ক্রমশ বিষিয়ে উঠছিল। কিন্তু তার পরও ভয় আর সংশয় থেকে মুক্ত হতে পারছিলাম না পুরোপুরি। আসলে আরো পরিস্কার করে বলতে গেলে বলতে হয়, উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না অনেক রহস্যেরই। মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য শুধু নয়, পত্র-পত্রিকায় নিরন্তর প্রচারিত অলৌকিক কাহিনীগুলো - সাইবাবা থেকে শুরু করে সাইদাবাদী পর্যন্ত - আমার কিশোর মনকে সবসময়ই আলোড়িত করে রাখত। প্রায়শই ভাবতাম, ঈশ্বর যদি নাই থাকবে, তা হলে এত বড় মহাবিশ্বটা এলো কোথা থেকে? আর প্রতিদিনই পেপারে পড়ছি এত

পীর-ফকির-সাধুবাবাদের রমরমা অলৌকিক কীর্তিকাহিনী। এগুলো কি তবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পরোক্ষ প্রমাণ নয়? পৃথিবীর চারদিকে প্রতিদিনই ঘটে যাচ্ছে অজস্র অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক ঘটনা - এগুলোরই বা কি ব্যাখ্যা? এগুলো সবই কি তাহলে মিথ্যা? এই তো সেদিনও সেবা প্রকাশনী থেকে রকিব হাসানের অনুদিত 'বার্মুডা ট্রায়েঙ্গেল' নামে দুই খন্ডের গল্পটা পড়লাম। কোন জাহাজ, উড়োজাহাজ গেলেই নাকি হারিয়ে যাচ্ছে ওই অমুঙ্গলে জায়গাটায়! আবার দিন কয়েক আগেই দৈনিক ইত্তেফাকে বেরুল কোন এক গ্রামে ঘটে যাওয়া 'পরীর আছরের' আধি-ভৌতিক কাহিনী। এগুলো কি 'ভগবানের লীলা' নয়? কিন্তু তারপরও ভগবানকে মেনে নিতে আমার এই সংশয়বাদী মনটা মোটেই সায় দিচ্ছিল না। আসলে 'ঈশ্বরের লেখা' বলে কথিত ধর্মগ্রন্থ গুলোতে একটু দেখে শুনে চোখ বুলালেই বোঝা যায় কত মিথ্যা, অসাড় আর রূপকাথা -উপকথায় পূর্ণ সেগুলো, ধর্মের অমানবিক আর নিষ্ঠুর দিক গুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম। সংশয় আর বিশ্বাসের দোলাচলে স্পন্দিত 'বিভ্রান্ত' মানসপটে তখন শুধুই বেয়ারা প্রশ্ন, অযাচিত কৌতুহল আর আবিরাম সত্যান্বেষণ! ঠিক এমনি এক সময়, দিন ক্ষণ সঠিক মনে নেই - সম্ভবত ১৯৮৮ সালের শেষ দিকে হবে, নিউমার্কেটে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ করেই প্রবীর ঘোষের লেখা 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটি নজরে আসে। হাতে নিয়ে পাতা উলটাতেই বুঝলাম এ এক 'গোলডেন মাইন'। বইটি কিনে নিতে দেরী করলাম না - বাসায় এসেই এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত গোগ্রাসে গিললাম। দেখলাম কি পরম যত্নে ভদ্রলোক এতদিনকার অলৌকিকত্বের গড়ে ওঠা প্রতিটি দাবীকেই নস্যাৎ করে ফাঁস করেছেন প্রতিটি ফাঁকি ও গোপন কৌশল, সেই সাথে তুলে এনেছেন বিশ্বের বিখ্যাততম অলৌকিক ক্ষমতাধরদের ঘটানো তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার নেপথ্য-রহস্য। বার্মুডা থেকে আদ্যামন্দির পর্যন্ত দীর্ঘ পরিক্রমায় প্রবীর তার বইয়ে দেখিয়েছেন, কোথাও অলৌকিক কিছু ছিল না, অলৌকিক কিছু নেই। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সমস্ত অবতার ও অলৌকিক ক্ষমতাধরদের কৌশল আয়ত্ব করেও প্রবীর কিন্তু অবতার সাজেননি, বরং বুজরুকদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ঘোষনা করেছেন - বিশ্বের কেউ অলৌকিক ক্ষমতার প্রমান রাখলে বা কোন জ্যোতিষী অভ্রান্ত গণনার পরিচয় দিলে দেবেন ৫০ হাজার (তৎকালীন) ভারতীয় টাকা। এখন পর্যন্ত একজন 'অলৌকিক পুরুষ'ও প্রবীরের সামনে তাদের স্বঘোষিত অলৌকিকত্বের কোন প্রমাণ রাখতে পারেন নি; বরং তার চ্যালেঞ্জের কাছে পরাজিতদের তালিকায় রয়েছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বহু খ্যাতনামা অবতার ও জ্যোতিষী। আমার কিশোর মনে সেই প্রথম রোপিত হল 'যুক্তিবাদের বীজ'; বুঝলাম ধর্মান্ধতার বাইরেও প্রগতিশীলতা আছে, আছে 'যুক্তিবাদ' বলে একটা কিছু। সে বই থেকেই পেলাম বিজ্ঞানের এক নবতর সংজ্ঞা যা এর আগে আমার মাথায় কখনই আসে নি। জানলাম, বিজ্ঞান বলতে কেবল গ্রামে গঞ্জের আনাচে-কানাচে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া বোঝায় না, বিজ্ঞান নয় কেবল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে থার্মোডায়নামিক্সের সূত্র গলাধঃকরণ, বরং মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলা, কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে যুক্তিবাদী হিসেবে গড়ে তোলাও বিজ্ঞানের একটা বড় এলাকা। আমি অভিভুত হলাম বিজ্ঞানের নবতর সজ্ঞায় ; আজ আমি বুঝি যে, আমরা যারা বিজ্ঞান-পেশার সাথে সরাসরি জড়িত তাদের কাঁধে পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি আরেকটা বাড়তি দায়িত্ব আছে - সেটা হল একটি বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ নির্মাণে

অবদান রাখা। আর সেজন্য দরকার একটি শক্তিশালী বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী আন্দোলনের। এগুলো যখন ভাবছিলাম তখনই নতুন করে একুশের বই মেলায় বেরুলো কৃষক-দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরের অমূল্য গ্রন্থ 'সত্যের সন্ধান'। সম্ভবতঃ কোন বাংলাদেশীর লেখা সবচেয়ে শক্তিশালী বিজ্ঞান-মনস্ক যুক্তিবাদী বই এটি। এর পরের বছরেই বেরোয় হুমায়ুন আজাদের 'নারী'। কাছ থেকে দেখলাম উদ্দীপ্ত নতুন এক তরুন সমাজকে - যারা পুরোন প্রথা ভাঙ্গতে চায়, গড়তে চায় মানবতাবাদী সমাজ। তসলিমার 'নির্বাচিত কলাম' তখন ইতোমধ্যেই একটি অংশের কাছে দারুন জনপ্রিয়। তসলিমার অনেক পংক্তি যেমন, 'আমি শৃঙ্খল ভেঙ্গেছি,পান থেকে খসিয়েছি সংস্কারের চুন' - তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রেরই মুখে মুখে। ধীরে ধীরে তৈরী হচ্ছিল মুক্ত-চিন্তা, নারীবাদ, যুক্তিবাদ আর মানবতাবাদের একটি বাতাবরণ, যার সূচনা হয়েছিল অনেক আগে - চল্লিশ শতকে : কাজী আবদুল ওদুদ আর আবুল হুসেনের মত লেখকদের হাত দিয়ে । আমিও ততদিনে পরিচিত হয়ে গিয়েছি বিভিন্ন প্রগতিশীল লেখকদের বিভিন্ন লেখার সাথে; রাহুল সঙ্কৃত্যায়ন, শফিকুর রহমান, আহমদ শরীফ, ভবানীপ্রসাদ সাহু, দেবী প্রসাদ চটটোপাধ্যায়, সুকুমারী ভট্টাচার্য, জয়ান্তনুজ বন্দোপাধ্যায় এ নামগুলো তখন আর অপরিচিত নাম নয় আমার কাছে। তারপরও দেখলাম আমাদের বিশ্বজগতকে সঠিকভাবে, যুক্তিনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা করা বাংলা বই বাজারে সত্যই অপ্রতুল। কোথায় কার্ল স্যাগানের 'Cosmos', স্টিফেন ওয়েইনবার্গের 'The First Three Minutes', অথবা স্টিফেন হকিং এর 'The Brief History of Time' এর মত বই, বাংলায়? আমার তখন মহাকাশ নিয়ে জানার খিদে উত্তরোত্তর রেড়েই চলেছে। এর মধ্যে মাধ্যমিক আর উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার চৌকাঠ পেরিয়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ ্যালয়ে পড়তে এসে পরিচিত হলাম আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্বের সাথে। জানার আগ্রহ ক্রমশঃ বাড়ছেই। জানলাম ম্যাক্স প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব আর আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের কথা। সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটি তা হল, আমি বুঝলাম স্কুল-কলেজের বইয়ের পাতায় লেখা 'বিজ্ঞানের' সংজ্ঞার মধ্যেই শুধু বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সীমাবদ্ধ নয় , বিজ্ঞান আসলে এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে বুদ্ধিমান প্রাণীরা বুঝতে চায় প্রকৃতিকে, এবং সেই সংগে নিজেকেও। আর সেজন্যই নতুন নতুন কলকব্জা বানানোর পাশাপাশি বিজ্ঞানীরা বুঝতে চান অতি ক্ষুদ্র অনু-পরমানুর ভিতরে কি ঘটছে; সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে চান অতি দূরবর্তী গ্যালাক্সিতে ঘটে যাওয়া সুপারনোভা বিস্ফোরণের ঘটনা পর্যন্ত।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই পাড়ি জমালাম দেশের বাইরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসময়েই মুলতঃ আমার লেখালিখির জগতে প্রবেশ, ইন্টারনেটের মাধ্যমে। জামাল হাসান নামে সদ্য পরিচিত এক ভদ্রলোক আমার ব্যক্তিগত ওয়েব-সাইটের ব্যাপারে বেশ আগ্রহী হন এবং একটি ঠিকানায় আমাকে কিছু প্রবন্ধ পাঠাতে উৎসাহিত করেন। ঠিকানাটা আসলে একটা অন-লাইন পত্রিকার। নাম ''এন এফ বি'', অর্থাৎ নিউজ ফ্রম বাংলাদেশ, ঠিকানাঃ- www.bangladesh-web.com/news. খুব যে আগ্রহ

নিয়ে গেলাম তা নয়। কিন্তু গিয়ে অবাকই হলাম । পড়লাম বেশ কিছু তথ্য-বহুল উঁচু মানের লেখা। ইনটারনেটের বাংলা ভাষাভাষীদের কাছ থেকে এমন উঁচু মানের যুক্তিবাদী ইহজাগতিক লেখা ? সত্যিই অবাক করার মত ব্যাপার । একটা নিবন্ধের কথা তো এখনও মনে আছে । ''কোরাণে রূকথা - কে এই জুল কারণাইন ?''। আমি পড়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। লেখকদের নামগুলোও কেমন অদ্ভুত। কামরান মির্জা, ফতেমোল্লা। কখনো কি শুনেছি? মনে করতে পারলাম না।

সেই থেকে শুরু । ধীরে ধীরে আরও পেলাম আবুল কাশেম, অপার্থিব জামান, নারায়ণ গুপ্ত (প্রয়াত), এষণ ওয়াহিদ, সাব্বির আহমেদ, ডঃ জাফর উল্লাহ, জাহেদ আহমেদ, ডঃ আলী সিনা, ডঃ কৌশিক সেন, পরামানব, শবনম নাদিয়া, মোঃ আসগর, ডঃ আলমগীর হোসেন, অ্যালেন লেভিন, কিশান, স্বপন বিশ্বাস, নভো (চে), মুঘল, সৈয়দ হাবিবুর রহমান, নন্দিনী হোসেন, আফরোজা, আদনান, শাহাদাত, ইমরান, রায়হান এবং আরও অনেককে। প্রত্যেকেই আগুনের আঁচ পোহানো এক একটি অগ্নিস্ফুলিংগ। পরবর্তীতে এদের অনেককে নিয়ে আমি 'মুক্তমনা' (http://www.mukto-mona.com/) নামে একটি প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী অন্তর্জাল (Internet) আলোচনাচক্র গড়ে তুলি। প্রবাসী বাঙ্গালীরা যারা অন্তর্জাল আলোচনাচক্রগুলি সম্বন্ধে একটু-আধটু খোঁজ খবর রাখেন, তারা সবাই একনামে মুক্তমনাকে চেনেন। কারণ অনেকেই মনে করেন যে, চলমান ধারার বিপরীতে সবময়ই মুক্তমনা ভিন্নকথা শোনায়। ধমার্ন্ধতা আর সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে অনেকের কাছেই মুক্তমনা আজ এক চলমান বহ্নিশিখা, ঘোর অমানিশায় পথ দেখানো এক আলোকবর্তিকা। মুক্ত-মনার অভ্যুদয়ের মাধ্যমে আমি আমার দীর্ঘদিনের লালিত একটি স্বপ্ন - অসমাপ্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পরিচালনা করতে উন্মুখ হলাম, যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠবে 'চেতনা মুক্তির' লড়াই - যার মাধ্যমে জন চেতনাকে পার্থিব সমাজমুখী করে তোলা, প্রতিটি শোষণ ও বঞ্চনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা সম্ভব। মুক্ত-মনার পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বাতাবরণ তৈরীতে জোর দেওয়া হল তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক মন-মানসিকতা গঠণের উপর। বিজ্ঞানমনস্ক মন-মানসিকতা এমনি এমনি গড়ে ওঠে না, বরং মানসিকতা গড়ে ওঠে যুক্তির পথ ধরে, নিরন্তর এবং ব্যাপক বিচার-বিতর্কের পথ ধরে। আজ ইন্টারনেটের কল্যাণে বিশ্বাস এবং যুক্তির সরাসরি সংঘাতের ভিত্তিতে যে সামাজিক আন্দোলন বিভিন্ন ফোরামগুলোতে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে, তা মুক্ত-মনারা মনে করে প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ-চার্বাকদের লড়াইয়ের মত বিশ্বাস ও যুক্তির দ্বন্দ্বেরই একটি বর্ধিত, অগ্রসর ও প্রায়োগিক রূপ। এ এক অভিনব সাংস্কৃতিক আন্দোলন, বাঙ্গালীর এক নবজাগরণ যেন। গত কয়েক বছরে স্বচ্ছ চিন্তাচেতনা সম্পন্ন মুক্ত-মনা যুক্তিবাদীদের বিশাল উত্থান ঘটেছে বিভিন্ন ফোরাম এবং আলোচনাচক্রে, যা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যমে সম্ভব ছিল না মোটেই। জনগণের মধ্যে বিভিন্ন মত থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং বিভিন্ন মতামতের দ্বন্দ্ব প্রয়োজনীয়, উপকারী এবং অনিবার্য। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবিহীন স্বচ্ছ এবং সুস্থ

বিতর্কের অবকাশ সৃষ্টি হলে জনগণের মধ্যে মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবোধের উপর আকর্ষণ বাড়বে এবং মিথ্যা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে তারা যুক্তিনিষ্ঠ হয়ে উঠবে ক্রমান্বয়ে। যুক্তিনিষ্ঠ মন-মানসিকতাই অবশেষে জনগণকে পরিচালিত করবে আধ্যাত্মবাদ পরিত্যাগ করে মানবমুখী সমাজ বিনির্মাণে, সামিল করবে বঞ্চনা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সংগ্রামে। এই আশা নিয়েই ২০০১ সালের ২৬ এ মে তারিখে মুক্ত-মনার উত্থান ঘটেছিল অত্যন্ত সীমিত পরিসরে মাত্র ৩০ জন সদস্য নিয়ে, আজ বছর তিনেকের মধ্যেই প্রায় দু'হাজার সদস্যের পদচারণায় মুখরিত। সদস্য হিসেবে মুক্ত-মনাকে অলঙ্কৃত করে আছেন ডঃ অজয় রায়, ডঃ মিজান রহমান, প্রবীর ঘোষ, তসলিমা নাসরিন, বেলাল বেগ, শাহারিয়ার কবির, ডঃ গোলাম মুর্শিদ, ডঃ মোহসিন সিদ্দিকী, জেমস র‍্যান্ডি, পল কুর্ৎস, ডঃ পারভেজ হুদোভয়, ডঃ ভিকটর স্টেংগরের মত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বরা। প্রয়াত প্রথাবিরোধী লেখক ডঃ হুমায়ুন আজাদ তার জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত মুক্ত-মনার সদস্য হিসেবে ছিলেন।

যা হোক, এর মধ্যে আমার বাংলায় লেখার আগ্রহও বেড়েছে বেশ। এর পেছনে ক্যানাডা প্রবাসী এবং মুক্ত-মনার অকৃত্রিম বন্ধু ডঃ শাকিলের তৈরী 'বর্ণ সফটের' ভুমিকা স্বীকার করতেই হবে। যারা বর্ণ সফটের সাথে এখনও পরিচিত নন, বিশেষতঃ তাঁদের জন্য বলি, বর্ণ সফট একটি স্মার্ট, সহজ, সয়ং সম্পূর্ণ এবং প্রফেশনাল বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসিং সফট ওয়্যার, আমাদের মত 'বাংলা টাইপিং' এ বকলম লেখকদের জন্য দারুন উপকারী। বাংলায় আমরা তিন শ র বেশী character (বর্ণ, চিহ্ন, বর্ণাংশ, যুক্তাক্ষর ইত্যাদি) ব্যবহার করি। কপম্পিউটারে বাংলা টাইপ করতে হলে ১৭০টি keystroke মুখস্থ করতে হয় বিভিন্ন কম্বিনেশনে। তাই এই কাজটি পুরোপুরি পেশাদার বাংলা-টাইপিষ্ট নির্ভর। এত ধরনের জটিলতার কারণেই আমার কখনও 'বাংলা টাইপিং' শেখা হয়ে ওঠে নি। বর্ণসফট এ সমস্যা থেকে আমাকে অবশেষে মুক্তি দিল। দেখলাম ইংরেজীতে 'bangladesh' টাইপ করলেই কম্পিউটারের মনিটরে অবিকলভাবে ফুটে উঠছে 'বাংলাদেশ'। এ এক দারুন অভিজ্ঞতা। এই বর্ণসফটের সাহায্যেই আমি লিখি আমার প্রথম বাংলা প্রবন্ধ 'বিজ্ঞানময় কিতাব'। আমার প্রবন্ধটি মুক্ত-মনা, ভিন্নমত, মুক্তচিন্তা সহ আরো কিছু অন লাইন ফোরাম এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলে বেশ পাঠকপ্রিয়তা পায়। তার ফলস্রুতিতেই আমার হাত দিয়ে পরবর্তীতে উঠে আসে 'মুক্ত-মনা কারা', 'নৈতিকতা কি শুধুই বেহেস্তে যাওয়ার পাসপোর্ট?', 'যুক্তির আলোয় দেশের ভাবমূর্তি এবং দেশপ্রেম' এ ধরনের প্রবন্ধগুলো। কিন্তু প্রবন্ধগুলোর প্রায় সবগুলোই লেখা হয়েছিল তখন ধর্ম আর দর্শন বিষয়ক বিভিন্ন বিতর্ককে কেন্দ্র করে।

বিতর্কের গ্যাড়াকলে একবার পড়লে উঠে আসা খুব মুশকিল। যারা অনলাইন ফোরামগুলোতে লেখালেখি করেন, এ ব্যাপারটি তারা সবাই জানেন। আমিও গ্যাড়াকলে পড়লাম। কেউ আমার প্রবন্ধের সমালোচনা করে কিছু লিখলেই কিংবা কেউ কোন ধরনের বিতর্কের সূচনা করলেই আমিও পালটা জবাব দেওয়ার জন্য আরেকটি লেখা লিখতাম। এ এক অদ্ভুত নেশা। এতে সময়

ব্যয় হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু মৌলিক লেখা তেমন একটা এগুচ্ছিল না। এ গ্যাড়াকল থেকে এবারে উদ্ধার করল আমার সঙ্গি এবং শুভানুধ্যায়ী বন্যা। বলল, 'অভি, কি সব অর্থহীন বিতর্ক করে অযথা সময় নষ্ট করছ! বিজ্ঞান নিয়ে,মহাকাশ নিয়ে তোমার কত আগ্রহ, কই সেগুলো নিয়ে তো কিছু লিখছো না!' আমার টনক নড়ল। ভাবলাম, তাই তো! যে বিষয়টাকে ঘিরে সেই কিশোর বয়স থেকে আমার সমস্ত আগ্রহ, উচ্ছ্বাস আকাঙ্খা আবর্তিত হয়েছে সে ব্যাপারটিকেই কিভাবে আমি অবজ্ঞা করে থাকলাম, এতটাকাল! ভাবলাম লিখব। কিভাবে লিখব, কোত্থেকে শুরু করব, তা জানি না, কিন্তু লেখাটা শুরু করব। বোধহয় সেই শুভক্ষণেই রচিত হয়েছিল 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী'র পটভূমি।

লিখব তো বললাম, কিন্তু লিখতে গিয়ে পড়লাম বিপদে। নিছক রসকসহীনভাবে 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' পাঠকদের সামনে তুলে ধরাটা আমার লেখার উদ্দেশ্য ছিল না, আর তাছারা ও ধরনের ইতিহাস বিষয়ক বই তো বাজারে হাজারটা আছে। আমি চাইছিলাম আমার লেখার মাধ্যমে এমন একটা ছবি পাঠকদের কাছে স্পষ্ট করে তুলতে যাতে তাঁরা এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের সামগ্রিক রূপটিকে যৌক্তিকভাবে বুঝবার মত অবস্থায় পৌঁছুতে পারেন। ইতিহাসের ধারা ভেঙে নিউটনকে আঁধারের যাত্রীদের তালিকার শীর্ষে নিয়ে আসা হয়েছে এ জন্যই। নিউটন যে কেবল ক্যালকুলাসের স্রষ্টা, বলবিদ্যার সূত্রের আবিস্কারক, কিংবা মহাকর্ষের একটি সার্বজনীন তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন তাই নয়, তিনি টলেমীর ভূ-কেন্দ্রিক সৌরজগতের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে এমন একটি 'সুস্থিত' বিশ্বব্রহ্মান্ডের মডেল আমাদের উপহার দিয়েছিলেন যেটি আইনস্টাইন আসার আগ পর্যন্ত প্রায় তিনশ বছর ধরে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছে। নিউটন মহাকর্ষ সূত্র আবিস্কারের পর গনিতজ্ঞ লীবনিৎস নাকি রাগ করে বলেছিলেন, 'এই সূত্র আবিস্কারের পর আমাদের করার মত কাজ আর কিছুই বাকী থাকল না। মহাবিশ্বের সব কিছুকেই মনে হচ্ছে এই একটা সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে'। আজকের দিনের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে লীবনিৎসের উক্তিটি অতিশয়োক্তি মনে হতে পারে, কিন্তু সে সময়কার কথা মাথায় রাখলে বোঝা যায়, কত ব্যাপক ছিল তাঁর অবদান। পরবর্তী পর্বগুলোতে নিউটনের পূর্বসূরী কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিওকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে তাঁদের অবদানের জন্যই নয় কেবল, সেই সাথে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়কে তুলে ধরতে। পাঠকেরা বিজ্ঞানের উপর চার্চের সেসময়কার একগুঁয়ে মনোভাব আর সমাজের উপর বিশাল প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিচয় পাবেন। জানবেন, অশীতিপর বৃদ্ধ গ্যালিলিওকে (যাকে স্টিফেন হকিং মনে করেন 'আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের জনক') বাইবেল বিরোধী বৈজ্ঞানিক সত্য উদঘাটনের জন্য কি নিদারুন নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটেই জিওর্দানো ব্রুনোর কথা একটু ব্যাপক পরিসরে আলোচনায় এসেছে। অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই পুস্তকেই দেখেছি ব্রুনোকে রীতিমত অবহেলাই করা হয়েছে, তার অবদানের কথা একেবারে অনুক্তই থেকে গেছে। বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিচল থেকে নিজের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দেওয়ার ঘটনা মানবজাতির ইতিহাসে কি খুব বেশী আছে? নেই! ব্রুনোর আত্মত্যাগের কাহিনী একটু বিষদভাবে না আনলে এই গ্রন্থটি আর দশটা বিজ্ঞানের 'নিরস টেক্সট বুক' এ পরিণত হত, যা

ছিল স্বাভাবিকভাবেই অনাকাঙ্খিত। তবে পাঠকেরা অনুযোগ করতে পারেন এই বলে যে, অনেক আঁধারের যাত্রীরা সেইভাবে পাদ-প্রদীপের আলোয় আসেননি। এটার মধ্যে যে কিছুটা সত্যতা নেই, তা নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি সে সময়কার দুই প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ জোহান কেপলার আর টাইকো দ্য ব্রাহের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। ব্রাহের নিখুঁত পর্যবেক্ষণ আর কেপলারের গানিতিক তত্ত্ব সে সময় রচনা করেছিল আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত, যা পরবর্তীতে গ্যালিলিও এবং নিউটনকে বিশ্বরহস্য উন্মোচনে সাহায্য করেছিল অনেক ব্যাপক পরিসরে। এই ব্যাপারটি এ গ্রন্থে এতটা স্পষ্ট হয়নি বলে অনেক পাঠকের মনে খেদ থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে শুধরে দেওয়ার প্রত্যাশা রইল।

আইনস্টাইনের উল্লেখ অনেকটা বেশী পরিসর জুড়ে রয়েছে। এটার পেছনে কোন ধরনের অস্বাভাবিকতা নেই। আমি যখন এই বইটির ভুমিকা লিখছি, তখন দেখলাম 'সায়েনটিফিক আমেরিকান' এবং 'ডিসকভার', দুই জনপ্রিয় ম্যাগাজিন তাদের সেপটেম্বর ২০০৪ ইস্যুতে আইনস্টাইনের 'মিরাকেল ইয়ার' (১৯০৫) কে স্মরণ করেছে অনেক বড় আকারে। ডিসকভারের বিশেষ নিবন্ধে ওয়ালটার আইজ্যাকসন বলছেন :

'আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব শুধু পদার্থবিদ্যাকেই বদলে দেয়নি, সেই সাথে বদলে দিয়েছে বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে, বদলে দিয়েছে সমাজকাঠামোকেও।'

গ্যালিলিও-নিউটন রচিত বিশ্বজগতের ভিত্তি ছিল কতগুলো পরম নিয়ম আর ধারণা, আইনস্টাইনের বলিষ্ঠ আঘাতে যেন এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের সুস্থিত মডেলটি খর-কুটোর মতই ধ্বসে পড়ল। আইনস্টাইনের জগতে স্থান আর কাল আর 'পরম সত্তা' হিসেবে টিকে রইল না, পরিবর্তিত হয়ে উত্তোরিত হল 'আপেক্ষিকতা' নামক চতুর্দশপদী কবিতার এক বিমূর্ত ছন্দে। এ পরিবর্তিত দৃষ্টিভংগি শুধু স্থান-কালের ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ রইল না, বরং সমাজের সবরকম পরম সত্তাগুলোর প্রতি আমাদের অন্ধ আনুগত্যকেও প্রশ্নবিদ্ধ করল, জন্ম নিল নতুন দর্শন এবং নৈতিকতারও। ইতিহাসবিদ পল জনসন বলেন, 'আপেক্ষিক তত্ত্ব শুধু একটি তত্ত্ব নয়, এ যেন একটি তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি, যা দিয়ে জগতের সমস্ত পুরোন সংস্কার, ধ্যান ধারণা গূলোকে আগাগোরা ছিড়ে ফেলা যায়।' এক শতাব্দী আগে ডারউইনবাদের উত্থান যেমন শুধু জীববিজ্ঞানকেই আলোড়িত করেনি, সেই সাথে আলোড়িত করেছে আমাদের প্রথাগত সমাজব্যবস্থাকেও আর আমাদের সনাতন চিন্তাপদ্ধতিকেও। ঠিক একইভাবে আপেক্ষিক তত্ত্বও আমাদের বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে নতুনভাবে।

নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ সুব্রামনিয়াম চন্দ্রশেখর নাকি বলতেন, 'আরে আইনস্টাইন নিজেই আপেক্ষিক তত্ত্ব খুব বেশী বুঝতেন না।' চন্দ্র এই কথাগুলো বলতেন আইনস্টাইনকে খাটো করবার জন্য নয়, বরং বলতেন আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রকৃতি, সম্ভাবনা ও ব্যাপ্তি আসলে কতটা বিশাল- এটি বোঝাতে। আইনস্টাইনের এই তত্ত্ব থেকেই কিন্তু পরবর্তী সময়গুলোতে

বেরিয়ে এসেছিল যে আমাদের মহাবিশ্ব ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে, জানা গিয়েছিল কৃষ্ণ গহবরের অস্তিত্বের পূর্বাভাস। আজকের দিনে স্টিফেন হকিং আর রজার পেনরোজেরা কৃষ্ণ গহবর আর অদ্বৈত বিন্দুর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান নিয়ে আসছেন, সেগুলো আইনস্টাইন প্রদত্ত সমীকরণ থেকে প্রাপ্ত সমাধানেরই বর্ধিত রূপ। এমনকি এসময়কার 'হট কেক' স্ট্রিং তাত্ত্বিকদের সেই যে তথাকথিত 'থিওরী অব এভ্রিথিং' নিয়ে প্রাণান্তকর গবেষণার ফলও মূলতঃ আইনস্টাইনের একদিনকার লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন।

সিরিজটির নাম 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' হল কেন এ নিয়ে কিছু বলা উচিৎ। সিরিজটি লেখার সময় আমি আসলে ভেবে পাচ্ছিলাম না এমন একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক সিরিজের নাম কি হতে পারে। কাব্যিক ধাঁচের নামের প্রতি আমার আকর্ষণ সব সময়ই প্রবল। সে ধরনের কিছু আর খুঁজে পাচ্ছিলাম কই? এমনি একটা অগোছালো অলস দুপুরে ঘরের মধ্যেই পায়চারী করতে করতে আমার বুক শেলফে রাখা আমার প্রিয় কার্ল স্যাগানের বইটা অবচেতন মনেই হাতে তুলে নিলাম। মলাটে 'The Demon-Haunted World' শিরোনামের নীচেই সুন্দর একটা উক্তি - 'Science As a Candle in the Dark'। চমৎকার! এমনি সুন্দর একটা পংক্তি কি বাংলায় খুঁজে পাব, যার মাধ্যমে ধ্বনিত হতে থাকবে আঁধার ঘুচিয়ে আলোকিত পথে যাত্রার ইঙ্গিত? স্যাগানের বইটা বুকের মধ্যে ফেলে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। তন্দ্রা মত এসেছিল হয়ত। জানিনা মনের ভুলে বিছানার পাশে রাখা ক্যাসেট প্লেয়ারটা চালিয়ে দিয়েছিলাম কিনা। যখন আধো ঘুম - আধো জাগার ঘোর লাগা ভাবটা কাটল, ক্যাসেটে তখনও বেজে চলেছে প্রিয় রবীন্দ্র সঙ্গিতটি :

তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা?
ওই যে সুদূর নিহারীকা -
যারা করিয়াছে ভীর,
আকাশের নীর
ওই যারা দিন-রাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী,
গ্রহ তারা রবি ...

আর এখানে এসেই আমি থমকে গেলাম। 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' - এই শব্দ ক'টি মনের গহীনে কোথায় যেন একটা অনুরনন তুলল ; ভাবলাম, এর চাইতে কাব্যিক আর মনোহর শিরোনাম আর কি হতে পারে? যে গানটি শত বছরেরও আগে কবিগুরু দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে কাদম্বরী দেবীকে স্মরণ করে লিখেছিলেন, কখনও কি ঘুর্নাক্ষরেও ভেবেছিলেন, এর একটি পংক্তি ব্যবহৃত হবে এক অখ্যাত লেখকের প্রথম বইয়ের শিরোনাম হিসেবে?

ভেবেছিলাম ছোট একটা ভুমিকা হবে বইটির। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখলাম ভুমিকা ক্রমশঃ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতরতর হচ্ছে। বিপদ এড়াতে এখনই লাগাম টানতে হচ্ছে। পাঠকদের ইতোমধ্যেই ধৈর্য্যচুতি ঘটে গেছে বোধ হয়। আসলে আমার এবং মুক্ত-মনার শুভানুধ্যায়ীরা এই বইটিকে তাঁদের এবং মুক্ত-মনার প্রজেকট হিসেবেই নিয়েছেন। এ বইটির সাফল্যকে তারা দেখছেন তাঁদের সাফল্য হিসেবে, মুক্ত-মনার অগ্রগামীতা হিসেবে। এদের কথা তো একটু বেশী বলতে হবেই! এ বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় রয়েছে তাঁদের অনুপ্রেরণা আর উৎসাহের ছাপ। যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা ছাড়াও 'মুক্ত-মনা', 'ভিন্নমত', 'বাংলার নারী', 'মুক্তচিন্তা', 'ফিউচার অব বাংলাদেশ' সহ বিভিন্ন অন লাইন ফোরামের অগনিত সদস্য বিভিন্ন ভাবে সাহায্য সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। মুক্ত-মনায় রাখা সিরিজটির উপর সাধারণ পাঠকদের কাছ থেকে অনেক ধরণের সৃজনশীল মন্তব্য, মতামত পেয়েছি, যেগুলো পরবর্তীতে আমার এই বইয়ের পান্ডুলিপি তৈরীর কাজ অনেক সহজ করেছে। সিরিজটি মুক্ত-মনায় প্রকাশের পর মুক্ত-মনা সদস্য স্নিগ্ধা আলী আমার লেখাটির উপর একটি মনোজ্ঞ পর্যালোচনা লিখেছিলেন, যেটি পরবর্তীতে আমার পান্ডুলিপির বেশ কিছু পরিমার্জন ঘটাতে বাধ্য করেছে। তাঁদের সকলের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক (অবসর প্রাপ্ত) এবং শিক্ষাবিদ ডঃ অজয় রায় পান্ডুলিপিটির সংশোধন ও পরিমার্জনই শুধু করেন নি, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য আলাদা করে পরিশিষ্ট সংযোজন করে বইটির উৎকর্ষতা অনেক বাড়িয়েছেন। পরিশেষে, খ্যাতনামা তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ হারুন অর রশিদ এই বইয়ের জন্য একটি সুন্দর মুখবন্ধ লিখে আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

অভিজিৎ রায়
১১/৯/২০০৪